DEC. 02 2001

যুগান্তর

তারেক শামসুর রেহমান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ

সরকার অতি সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও উপউপাচার্য নিয়োগ করেছে। ঢাকা, রাজশাহী, কৃষি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যরা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উপাচার্য পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। হাইকোর্ট একাধিক রিট মামলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শো-কজ করেছেন। উচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপাচার্যদের ভূমিকা, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

অভিযোগ উঠেছে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অপসারণের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসন লংঘিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপাচার্য এই ঘটনাকে 'ধর্ষণ' হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি স্বায়ত্তশাসন লংঘিত হয়েছে? ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী (ধারা ১১(২)) চ্যান্সেলর উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা রাখেন। চ্যান্সেলর নিয়োগকর্তা। যিনি নিয়োগকর্তা তিনি অপসারণ করারও ক্ষমতা রাখেন। চ্যান্সেলর ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৭ সালে প্রণীত জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টের ১৬ ধারাবলে ৪ জন ভিসি ও ৩ জন প্রো-ভিসিকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এবং সেই শূন্যপদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১১(২) ধারাবলে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছেন। নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা এখন সিনেট আহ্বান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি উপাচার্য প্যানেল গঠন করবেন এবং চ্যান্সেলর ওই প্যানেল থেকে একজনকে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১১(১) ধারাবলে নিয়োগ দেবেন। এ ক্ষেত্রে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের অব্যাহতি দেয়াজনিত কারণে শূন্যপদের সৃষ্টি হওয়ায় চ্যান্সেলর অধ্যাদেশের ১১(২) ধারাবলে যাদের নিয়োগ দিয়েছেন তা বৈধ। এখানে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রথম যে জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টের ধারা প্রয়োগ করা হল তা নয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে এই ধারাবলেই অপসারণ করা হয়েছিল। সেদিন এ নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন ওঠেনি। কোন বিবৃতিও আমাদের চোখে পড়েনি। আজ কেন হল। সেটাই প্রশ্ন। দেখ গেছে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতের অনুসারী এবং সেই রাজনৈতিক চেতনা ধারণ করে বিগত বছরগুলোতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিরোধী দলনেত্রী শেখ হাসিনাও একটি বিবৃতি দিয়েছেন। শেখ হাসিনার দেয়া বিবৃতির সঙ্গে আজকে যারা বিবৃতি দিয়েছেন, তাদের বক্তব্যের একটি মিল লক্ষ্য করা যায়।

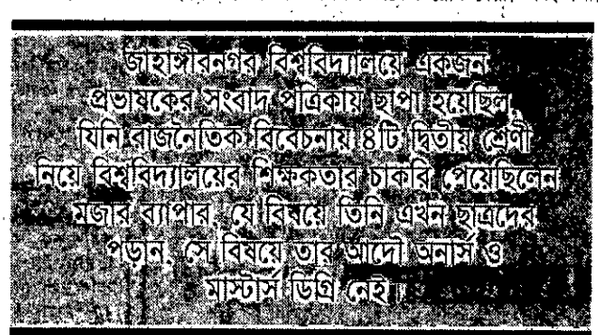

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে উপাচার্যদের নিয়োগ নিয়ে যত বিতর্ক হচ্ছে, অতীতে সে রকমটি হয়নি। অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। সরাসরি যিনি রাজনীতি করেন, তাকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়া কি সঠিক ছিল? কিংবা তাকে উপাচার্য হিসাবে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তটি কি রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত ছিল না? একজন ব্যক্তি, যিনি একটি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি কি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন? না, পারেন না। আর পারেন না বলেই তার আমলে যত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, সেখানে মেধার চেয়ে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। আজ তিনি যত কথাই বলুন না কেন; বাস্তব সত্য হচ্ছে তার শাসনামলে ছাত্রদলের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রাবাসে থাকতে পারেনি। দলীয়ভাবেই তিনি প্রশাসন চালিয়েছেন। দল তার কাছে বড় ছিল, মেধা বিবেচনায় স্থান পায়নি। তার মুখে স্বায়ত্তশাসনের কথা শোভা পায় না। অব্যাহতিপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েস আওয়ামী লীগ কিংবা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য ছিলেন না বটে। কিন্তু উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি সবচেয়ে বড় আওয়ামী লীগার হয়ে যান। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি পত্রিকায় কলাম লিখে বিএনপির বিষোদ্গার করেছেন। প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছিলেন। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার সমালোচনা করতেও তিনি পিছপা হননি। একজন উপাচার্য, তিনি কি পত্রিকায় মাসের পর মাস কলাম লিখে বিএনপির সমালোচনা করতে পারেন? পারেন কি আওয়ামী লীগের পক্ষে কলম ধরতে? তাহলে একজন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তার পার্থক্য থাকল কোথায়? অধ্যাপক বায়েস এই কাজটি প্রকাশ্যেই করেছিলেন। তিনিও নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি। অধ্যাপক সাইদুর রহমান, যিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। উপাচার্য থাকা অবস্থাতেই তিনি আওয়ামী লীগের জনসভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। একজন ভিসি কি এ কাজটি করতে পারেন? কিংবা তার কি জনসভায় বক্তৃতা দেয়া উচিত ছিল? আওয়ামী লীগের জনসভায় তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি প্রমাণ করে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না। অথচ আমরা নিরপেক্ষতাই আশা করেছিলাম। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা। তার ভূমিকার সঙ্গে অধ্যাপক সাইদুর রহমানের ভূমিকার কোন পার্থক্য ছিল না।

আমরা আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করছি। কিন্তু যিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত, রাজনৈতিক বিবেচনা যাদের কাছে প্রাধান্য পায়, তাদের কাছে স্বায়ত্তশাসনের মূল্য কি? স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি? সিনেটে নির্বাচিত হওয়া? দলীয় অনুসারীদের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া? এবং দলীয় অনুসারীদের নিয়ে সিন্ডিকেট গঠন করা? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ প্রভাষকের কথা জানি, যিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হিসাবে মফস্বলের একটি কলেজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রভাষকের সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, যিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় ৪টি দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার, যে বিষয়ে তিনি এখন ছাত্রদের পড়ান, সে বিষয়ে তার আদৌ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি নেই। তবুও প্রশাসন তাকে চাকরি দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রশাসন তার চাকরি স্থায়ীও করেছিল। এর নাম কি স্বায়ত্তশাসন? যে স্বায়ত্তশাসনের নামে উপাচার্যরা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নিজের স্বার্থে, বিশেষ একটি দলের স্বার্থে প্রশাসন পরিচালনা করেন- আমরা সেই স্বায়ত্তশাসন চাই না। আমরা সেই স্বায়ত্তশাসন চাই- যে স্বায়ত্তশাসনে উপাচার্যদের জবাবদিহিতা থাকবে। তথাকথিত গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে উপাচার্যরা নির্বাচিত হবেন (সিনেট কর্তৃক), আর নিজেরা অগণতান্ত্রিক আচরণ করবেন তা তো কাম্য হতে পারে না। তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন উপাচার্যদের অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে। উপাচার্যরা তৈরি করেছেন একটি মোসাহেবী শ্রেণী। যে শ্রেণী তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। গত ৫ বছরে ঢাকা, রাজশাহী কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হল ছবি। এ ছবি কোন আশার কথা বলে না। এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক জসিমউদ্দিন আহমদের একটি বক্তব্য উল্লেখ করতে চাই। দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনিয়ম হয়েছে, তার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তার এই সৎসাহসের জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নয় বরং ঢাকা, কৃষি কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মগুলোর ব্যাপারে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর কিছু কিছু ধারা পরিবর্তন করে উপাচার্যদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করার বিষয়টি জরুরি।

আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়োগ নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিতর্কের অবসান হোক। বিষয়টির রাজনীতিকরণ ও অর্থহীন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় ধরনের সেশনজটের মুখে পড়েছে। এই সেশনজট প্রলম্বিত হোক- আমরা কেউ তা চাই না। শুভবুদ্ধির উদয় হোক- আমাদের প্রত্যাশা এটাই।

ড. তারেক শামসুর রেহমান : *রাজনৈতিক বিশ্লেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক*